জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২ ১ম পর্ব, ২য় সংখ্যা ২০১২ ISSN 2222-5188

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

- রোগ ও চিকিৎসা
- প্রয়োগ ব্যবস্থা
- স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য
- প্রচলিত রোগের নতুন চিকিৎসা

সূচী

রোগ ও চিকিৎসা ৩

প্রয়োগ ব্যবস্থা ৯

প্রচলিত রোগের নতুন চিকিৎসা ১২

স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য ১৩

স্বাস্থ্য টিপস ১৫

ইনফো কুইজ ১৯

সম্পাদক মন্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ খান রেজওয়ান হাবীব
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

মেডিকেল সাভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস্
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ

ইনফো মেডিকাস এর ২০১২ সালের দ্বিতীয় সংখ্যাটি আপনাদের হাতে পৌছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সংখ্যার রোগ ও চিকিৎসা বিভাগে বিভিন্ন প্রকার জ্বর ও তার চিকিৎসা বিস্তারিত তুলে ধরে হয়েছে। সেই সাথে এ রোগে আমাদের কয়েকটি ওষুধের ব্যবহারের উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ছাড়া নতুন বিভাগ প্রয়োগ ব্যবস্থায় ইনজেকশন দেয়ার খুবই প্রয়োজনীয় অথচ সহজ প্রণালী তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে বহুল আলোচিত পাইলস রোগের নতুন চিকিৎসা নিয়েও।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সমাচার পর্বে অতি প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষার উপর আলোচনা করা হয়েছে। আরও রয়েছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় টিপস স্বাস্থ্য টিপস বিভাগে এবং রয়েছে আপনাদের প্রিয় ইনফো কুইজ বিভাগ।

সবশেষে এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রইল শুভকামনা।

শুভেচ্ছান্তে

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস ম্যানেজার

প্রকার ভেদে জ্বরের চিকিৎসা

সরল জ্বর

১. কি?

যখন শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার চাইতে বেশী হয় তখন তাকে সরল জ্বর বলে।

পানিতে ভেজা, গরম লাগা, সর্দি, শোক, উত্তেজনা প্রভৃতি নানা কারণে হঠাৎ দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়

২. কারণ

এটি কোন নির্দিষ্ট জ্বর নয়। নানা জাতীয় কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। পানিতে ভেজা, গরম লাগা, সর্দি, শোক, উত্তেজনা প্রভৃতি নানা কারণে হঠাৎ দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। রাতজাগা, অনিয়ম, বেশি মদ্যপান, অতিরিক্ত মানসিক চাঞ্চল্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি কারণেও এটি হতে পারে। এর কোন নির্দিষ্ট কারণ বলা যায় না। এটি অনেক সময় আপনা থেকেই কমে যায়। এটি দীর্ঘস্থায়ী নয়। তবু প্রাথমিক অবস্থার জন্য জ্বর বা রোগ বলে বোঝা না গেলে, এর চিকিৎসা প্রয়োজন। অনেক সময় শরীরে গুপ্ত কোন জীবাণুর জন্যও জ্বর হতে পারে।

৩. লক্ষণ / চিহ্ন

- শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি, বমি বমি ভাব, মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ।
- প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে।
- চোখ জ্বালা, মাথায় ভারবোধ, দেহে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ এতে থাকতে পারে।

৪. পরীক্ষা

ইউরিন আর/ই, হিমোগ্লোবিন%, টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর, উইডাল টেস্ট, ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট টেস্ট করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- ট্যাবলেট এক্সেল (প্যারাসিটামল) ৫০০ মিগ্রা ঃ ১টা করে ২/৩ বার সেবন করতে হবে।
- জ্বর স্থায়ী হতে থাকলে যে কোন একটি অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল দিতে হবে-
  ক্যাপসুল এভলোমক্স (এমোক্সিসিলিন) ৫০০ মিগ্রা ঃ ১টি করে দিনে ৩/৪ বার দিতে হবে।

আবশ্যকতা দেখা দিলে রাত্রে ঘুমের ঔষধ দিতে হবে।

উপদেশ

- পূর্ণ বিশ্রাম।
- জ্বর বেশী হলে মাথা ধোয়ানো, স্পঞ্জ প্রভৃতি করতে হবে।
- দুধ, হরলিক্স, সাগু, বার্লি, ফলের রস প্রভৃতি পথ্য।

সর্দি জ্বর

১. কি?

এটি ভাইরাস জনিত জ্বর।

২. কারণ

- সাধারনত ভাইরাসের আক্রমণে এটি হয়ে থাকে।
- ঠান্ডা লাগানো, বৃষ্টিতে ভেজা, গরমের পরে হঠাৎ ঠান্ডা, পেট গরম হওয়া, অতিরিক্ত শ্লেষ্মাকর জিনিস খাওয়া প্রভৃতি কারণে এই জ্বর হয়।

৩. লক্ষণ

- নাক বা মাথার নানা সাইনাস এর ঝিল্লি (মিউকাস মেমব্রেন) আক্রান্ত হয়ে পানি পড়লে, তাকে সর্দি বলে।
- সর্দির সঙ্গে জ্বর থাকে।
- মাথাধরা ও মাথার যন্ত্রনা থাকে।
- চোখে জ্বালাপোড়া, গা-হাত-পা কামড়ানো, চোখ ছলছল করা, হাঁচি, চোখ লাল, গলাভাঙ্গা, কাশি, বুকে ব্যথা প্রভৃতি থাকে।
- অনেক সময় সর্দির সঙ্গে নাকে জ্বালা থাকে। মাথার প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়।
- সাধারণত ৯৯°-১০০° ফারেনহাইট অবধি জ্বর হয়।

৪. পরীক্ষা

ইউরিন আর/ই, হিমোগ্লোবিন%, টিসি, ডিসি, ই.এস.আর, এমপি টেস্ট, উইডাল টেস্ট করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- মাথা ধরা, মাথাব্যথা ইত্যাদি থাকলে দিতে হবে-
  ট্যাবলেট এক্সেল (প্যারাসিটামল) ৫০০ মিগ্রা ঃ ১টি করে দিনে ২/৩ বার সেব্য।
- কাশি থাকলে একটি সিরাপ দিতে হবে-
  সিরাপ মাইরক্স (এমব্রক্সল) ঃ ২ চামচ (১০ মিগ্রা) করে দিনে ২-৩ বার সেব্য।

উপদেশ

- বুকে ব্যথা বা গলায় বেশি সর্দি জমলে, বুকে সরষের তেল বা কর্পূর মিশ্রিত সরষের তেল মালিশ করা যেতে পারে।
- ঠান্ডা লাগানো উচিত নয়। সাগু, বার্লি, খই, মুড়ি, আদার রস প্রভৃতি খাওয়া ভাল। ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয় সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পূর্ণ বিশ্রাম।

ম্যালেরিয়া

১. কি?

ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট নামক জীবানুর কারণে এ রোগ হয়।

২. কারণ

ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট নামক এক শ্রেণীর প্রোটোজোয়া এই রোগ উৎপত্তির কারণ। ম্যালেরিয়ার জীবাণু নানা ধরণের হয়। যেমন- ক) বিনাইন টারসিয়ান, খ) কোয়ার্টান, গ) ম্যালিগনেন্ট টারসিয়ান। তার মধ্যে প্রথমটি বেশী হয়, তবে তৃতীয়টি সবচেয়ে মারাত্মক। এনোফিলিস জাতীয় মশার স্ত্রী জাতি কামড়ালে মানুষের শরীরে এই রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট নামক এক শ্রেণীর প্রোটোজোয়া এই রোগ উৎপত্তির কারণ। এনোফিলিস জাতীয় মশার স্ত্রী জাতি কামড়ালে মানুষের শরীরে এই রোগের জীবাণু প্রবেশ করে

একজন ম্যালেরিয়া রোগী থেকে এই জীবাণু অপরের দেহে সংক্রামিত হয়, এই মশার মাধ্যমেই।

রোদ-বাতাসহীন স্যাঁতসেতে ঘরে বাস, পঁচা পুকুরে গোসল করা, দূর্গন্ধময় বাতাস সেবন করা, অনেকদিন অনাচারে থাকা এসব হল গৌন কারণ।

জ্বরের স্থায়িত্ব অনুযায়ী প্রকারভেদ ঃ জ্বরের স্থায়িত্ব, অর্থাৎ জ্বর আসা ও নামা নানা ধরণের হয়ে থাকে। যেমন-

- দিনে একবার আসে এবং ছাড়ে।
- একদিন অন্তর জ্বর আসে ও ছাড়ে।
- দুদিন অন্তর জ্বর আসে।
- সপ্তাহে একদিন (নির্দিষ্ট দিনে) জ্বর আসে।
- ১৫ দিনে একদিন জ্বর আসে।

৩. লক্ষণ

- জ্বরের অবস্থা বর্ণনা- জ্বর হঠাৎ আসে। তিনটি অবস্থায় এটি প্রকাশিত হয়। তা হলো-

ক. শীত অবস্থাঃ এই অবস্থায় হঠাৎ প্রচন্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতে থাকে। রোগী এত কাঁপতে থাকে যে, তার দেহ লেপ ও কম্বল চাপা দিলেও কাঁপুনি বন্ধ হয় না। এই অবস্থায় জ্বর হঠাৎ বেড়েই চলে। জ্বর খুব বেড়ে গেলে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে। প্রতি মিনিটে জ্বর বাড়ে। প্রথমে ৯৯^{o}-১০০^{o} ফারেনহাইট । তার পর দ্রুত ১০৩^{o}-১০৫^{o} ফারেনহাইট এ পৌছায়।

খ. উত্তাপ অবস্থাঃ পূর্ণ বৃদ্ধি হয়ে গেলে, অর্থাৎ ১০৪^{o}-১০৫^{o} ফারেনহাইট জ্বর উঠে যাবার পর কাঁপুনি বন্ধ হয়। এই অবস্থাকে বলে উত্তাপ অবস্থা। অনেক সময় বমি বা পিত্তবমি হয়। ঐ সঙ্গে মাথাব্যথা, প্রলাপ, অবসন্নতা প্রভৃতি হয়ে থাকে।

গ. ঘর্ম অবস্থাঃ এর পরই ঘাম দিতে শুরু হয়। ঘর্ম অবস্থা আরামদায়ক। যত ঘাম হয়, জ্বরও তত কমে। শরীর সিক্ত হয়ে যায়। বার বার ঘাম মুছে দিতে হয়। জ্বর ছেড়ে যায় এবং দেহ অবসন্ন হয়। ইতিমধ্যে চিকিৎসা শুরু হলে পরদিন আর জ্বর আসে না। তা না হলে পরদিন বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আবার জ্বর আসবেই।

- অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বা প্যারাসাইট পাওয়া যায়।
- লাল রক্তকণিকা ধ্বংস হয় বলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। হিমোগ্লোবিন কমে যায়। মাঝে মাঝে পরিপূরক হিসাবে অপরিণত লালকণিকা দেখা দেয়। শ্বেতকণিকা জ্বরের সময় বৃদ্ধি পায়।
- প্লীহা বৃদ্ধি- প্রথম আক্রমণে প্লীহা (স্প্লিন) খুব বৃদ্ধি পায় না, তবে আক্রমন চলতে থাকলে এটি খুব বৃদ্ধি পায়। প্রথমে বড় ও নরম থাকে। দীর্ঘদিন ভুগলে পরে কিছু শক্ত হয়।
- রোগে ভুগলে যকৃত (লিভার) অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।
- প্রস্রাবে- ইউরোবিলিন খুব বেশি হয়। এলবুমিন ও থাকতে পারে। প্রস্রাব গাঢ় রং এর এবং ঘোলাটে হয়।
- ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়াতে রোগীর চেতনা হ্রাস বা লোপ পায়। খিঁচুনী, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।
- অনেক সময় পায়খানা তরল হয় ও আমাশয় দেখা দিতে পারে।

এই ভাবে বিনা চিকিৎসার ফলে পিত্তদোষ, জন্ডিস, পেটের রোগ প্রভৃতি হয়। রোগী কঙ্কালসার হয়- ভুগতে ভুগতে শেষে মৃত্যুবরন করে।

৪. পরীক্ষা

ইউরিন আর/ই, হিমোগ্লোবিন%, টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর, ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট টেস্ট করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- ক্লোরকুইন জাতীয় ঔষধ। ট্যাবলেট এভলোকুইন ২৫০ মিগ্রা।
  মাত্রা ঃ ৪ টি বড়ি একত্রে এবং ২ টি বড়ি ৬ ঘন্টা পর ২ দিন সেব্য। পরের দিন ১ টি বড়ি দিনে ২ বার ৩ দিন খেতে হবে।
- রোগ সেরে গেলেও আবার যাতে পুনরাক্রমণ না হয় তার জন্যে (ক্লোরোকুইন ফসফেট + প্রোগুয়ানিল) দিতে হয়। ম্যালেরিয়া সন্দেহ হলে রক্ত পরীক্ষা করা উচিত।

উপদেশ

- জ্বর ছেড়ে গেলে সাগু, বার্লি, ফলের রস, খইয়ের মন্ড প্রভৃতি দেওয়া হয়।
- স্যাঁতসেতে জায়গায় থাকা উচিত নয়। নোংরা পানিতে গোসল নিষেধ।
- রাতে মশারি টাংঙিয়ে শুতে হবে। ঝোপ-ঝাড়গুলিতে এরোসল স্প্রে করা উচিত।
- ক্লোরোকুইন ফসফেট + প্রোগুয়ানিল ট্যাবলেট ভাল রোগ প্রতিষেধক।

ডেঙ্গু জ্বর

১. কি?

এটি ভাইরাস জনিত রোগ।

এডিস জাতীয় এক ধরণের মশা এই রোগের জীবাণু বহন করে বলে জানা যায়। সব দেশের সব ঋতুতে সব অবস্থাতেই এই জ্বর হওয়া সম্ভব

২. কারণ

- ডেঙ্গু ভাইরাস নামে এক জাতীয় ভাইরাস এই রোগের কারণ।
- এক ধরণের মশা এই রোগের জীবাণু বহন করে বলে জানা যায়। সব দেশের সব ঋতুতে সব অবস্থাতেই এই জ্বর হওয়া সম্ভব।

৩. লক্ষণ/চিহ্ন

- প্রথম ২ দিন জ্বরের প্রকোপ বেশী থাকে, তারপর জ্বর কমতে শুরু করে। রোগী মোট ৫/৬ দিন এই রোগে ভুগে থাকে।
- সারা শরীরে (বিশেষ করে গ্রন্থিসমূহে) তীব্র ব্যথা, কাঁপুনি, শীতবোধ, হঠাৎ জ্বর প্রধান লক্ষণ। অত্যন্ত মাথা ব্যথা হয়। কখনো বমি থাকে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে শরীর প্রচন্ড কামড়ানো, কোমরে ও পায়ে ভয়ানক ব্যথা হয়ে থাকে।
- জ্বর ২-৩ দিন পরে ছেড়ে যায় বা খুব কমে যায়। ২-১ দিন কম থাকে বা থাকে না। আবার ২-৩ দিন প্রচন্ড জ্বর হয়। তাপ ১০২^{o}-১০৫^{o} ফারেনহাইট অবধি ওঠে। দ্বিতীয়বার জ্বর বৃদ্ধির সময় রোগীর হাত, পা ও বুকে এক ধরণের লালচে র‍্যাশ দেখা দেয়।
- রোগ সেরে গেলেও অনেকদিন অবধি রোগী খুব দূর্বল থাকে।

৪. পরীক্ষা

হিমোগ্লোবিন%, টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর, ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট টেস্ট করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- ট্যাবলেট এক্সেল (প্যারাসিটামল) ৫০০ মিগ্রা মাত্রা-১টি করে দিনে ২-৩ বার সেব্য।
- এই জাতীয় যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োজনে দিনে ৪ বার পর্যন্ত দেয়া যায়।
- রোগী দূর্বল হলে তাকে ডেক্সট্রোস অর্থাৎ গ্লুকোজ পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া ভিটামিন দিতে হবে।

উপদেশ

- জ্বর অবস্থায় হালকা পথ্য দিতে হবে। বার্লি, ফলের রস, হরলিক্স প্রভৃতি চলবে।
- এই রোগ রোগীকে দূর্বল করে। রোগ সেরে যাবার পর ঠিক মত খেতে হবে।

হামজ্বর

১. কি?

এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট সংক্রামক রোগকে হাম বা মিজলস বলে। ইহাতে প্রথমে জ্বর, সর্দি কাশি এবং শরীরের উপরিভাগে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালচে গুটির মত প্রকাশ পায়।

২. কারণ

- এক ধরণের ভাইরাস জাতীয় জীবাণু থেকে এই রোগ হয়। প্রধাণত শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশী হয়। ৩/৪ বছর বয়স থেকে ১৫-২০ বছর বয়স পর্যন্ত বেশী হয়ে থাকে।

- এটি খুব সংক্রামক রোগ। বাড়ীতে কারও হলে, সকলেই একে একে আক্রান্ত হতে থাকে। আর কোনও শিশু আক্রান্ত হলে, তাকে পৃথক ঘরে রাখা অবশ্যই কর্তব্য। কদাচিৎ পূর্ণ বয়স্কদের এই রোগ হয়।

শীত ও বসন্তকালে এই রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে ৭-২১ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়

৩. লক্ষণ

- শীত ও বসন্তকালে এই রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে ৭-২১ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়। প্রথমে সর্দি, কাশি, হাঁচি শুরু হয়। পরে মাথা ধরা, গা হাত পায়ে ব্যথা ও জ্বর হয়। প্রথমে একে সর্দি জ্বর বলে মনে হয়। তবে ২/১ দিনে জ্বর ছাড়ে না। ৪ দিনের মধ্যে গায়ে হামের র‍্যাশ বের হতে থাকে। তখন একে হাম বলে বোঝা যায়।
- ৩/৪ দিন পরে ধীরে ধীরে হাম মিলিয়ে যায় এবং জ্বর কমে যায়।
- অনেক সময় জ্বর হঠাৎ প্রকাশ পায় ও ১০২°-১০৩° ফারেনহাইট ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর ওঠে। সেই সময় রোগী প্রলাপ বকে ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অরুচি, বমি, কোষ্ঠকাঠিণ্য বা উদরাময় এই রোগের প্রধান উপসর্গ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ব্রঙ্কাইটস বা নিউমোনিয়া উপস্থিত হয়। তখন রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে প্রাণসংশয় দেখা দেয়।
- বাহ্যিক লক্ষন অনুযায়ী হামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

২. **সিম্পল মিজেলসঃ** অল্প জ্বর হয়, অল্প গুটি বের হয়। সত্বর সেরে যায়। রোগী বিশেষ কষ্ট পায় না।

৩. **এ্যাকিউট মিজেলসঃ** হঠাৎ বেশী জ্বর হয়ে শুরু হয়। প্রচুর গুটি বের হয়, জ্বর বেশী থাকে। অনেক সময় প্রলাপ বকা, চোখের প্রদাহ, কানে পুঁজ ইত্যাদি নানা লক্ষণ দেখা দেয়। রক্ত আমাশয় হতে পারে।

৪. **ব্রঙ্কোনিউমোনিক মিজেলসঃ** এই ধরণের হামে বুক, স্বর, ফুসফুস প্রভৃতি আক্রান্ত হয় এবং রোগীর অবস্থা ভয়াবহ হয়। অনেক সময় এ অবস্থায় শিশুরা মারা যায়।

৪. পরীক্ষা

বুকের এক্স-রে, হিমোগ্লোবিন%, টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- এ্যামপিসিলিন ড্রাই সিরাপঃ ১ চামচ করে দিনে ৩ বার সেব্য।
- সেফিম-৩ সাসপেনশনঃ ৫-১০ মাস বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৮ মিগ্রা/কেজি হিসেবে দিনে ১ চামচ করে ১ থেকে ২ বার সেব্য।
- রোগ জটিল হতে থাকলে বিভক্ত মাত্রায় বয়সানুযায়ী ইঞ্জেকশন ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন মাংসপেশীতে দিতে হবে। শরীরে চুলকানি থাকলে এসিট্রিন (এন্টিহিস্টামিন) সিরাপ ১ চামচ করে দিনে ৩ বার দিতে হবে।

  কাশি থাকলে মাইরক্স সিরাপ (এমব্রোক্সল) ১৫ মিগ্রা/৫ মিলি ১ চামচ করে দিনে ৩ বার সেব্য।

উপদেশ

- হাম খুব ছোঁয়াচে রোগ। এটা সব সময় মনে রাখতে হবে। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা উচিত। যাতে সহজে একজনের থেকে অন্যজনের দেহে রোগ সংক্রামিত না হয়। শিশুদের ঘরে আসতে দেওয়া উচিত নয়। রোগীকে মশারির মধ্যে রাখা দরকার।
- জ্বরের জন্য নিয়মিত স্পঞ্জিং, মুখগহব্বর ও চক্ষু পরিস্কার রাখতে হবে।
- প্রথমে তরল খাদ্য, পরে মাছ, ডিম, ডাল প্রভৃতি প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হয়।
- যদি খুব জ্বর থাকে কিন্তু দেহে ঘাম বের না হয়, তাহলে খারাপ লক্ষণ। এর সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করিয়ে দিলে ভাল হয় ।
- সাগু, বার্লি, ফলের রস, গ্লুকোজ প্রভৃতি পথ্য। জ্বর ছেড়ে গেলে ও হাম মিলিয়ে গেলে ভাত, তারকারি বা মাছের হালকা ঝোল দিতে হবে।

জলবসন্ত

১. কি?

ভেরিসিলা ভাইরাস জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট সংক্রামক রোগকে জলবসন্ত বলে।

২. কারণ

এই রোগের কারণ হলো এক জাতীয় ভাইরাস ভেরিসেলা যা খুব ছোঁয়াচে। এই রোগ শীতকালের শেষ ও বসন্তকালে বেশী হয়। এই রোগের আবির্ভাব হলে তা অনেক সময় এপিডেমিক আকারে দেখা দেয়। এই রোগ মারাত্মক নয় বটে তবে এটি যে খুব কষ্টদায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

৩. লক্ষণ

- লক্ষণ অনুযায়ী জলবসন্ত কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এক সময় সব স্তরের গুটি দেখা যায়। গুটিগুলো গুচ্ছে গুচ্ছে বেরোয়। বুকে পিঠে বেশী বেরোয়। পরে গুটি শুকোলে কোন দাগ থাকে না

১. **সিম্পল টাইপঃ** এটি অল্প জ্বর হয়ে সারা গায়ে বের হয়। তবে খুব বেশী বের হয় না, জ্বর অল্প হয়। জ্বর ৯৮°-১০০° ফারেনহাইট হয় ও গুটি বের হলে জ্বর ছেড়ে যায়।

২. **এ্যাকিউট টাইপঃ** এতে জ্বর খুব বেশী হয়। ১০২°-১০৪° ফারেনহাইট জ্বর ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে-হাতে-গায়ে ও কোমরে প্রচন্ড ব্যথা হয়। জ্বর আসার সময় কাঁপুনি থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই সারা গায়ে জল বসন্ত বের হয়। আসল বসন্তের চেয়ে এর গুটিগুলি বড় হয় ও সুক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত হয়। গুটি বের হলে জ্বর কমে যায়। অনেক সময় শুকোবার আগে জ্বর আবার বৃদ্ধি পায়। গুটিগুলোতে প্রথমে পানি সঞ্চার হয়। ধীরে ধীরে তা শুকিয়ে আসে। গুটি গলে গেলে ঘা বা ব্যথা হয়। তাই যাতে এগুলি না গলে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

এই ধরণের বসন্তে মাঝে মাঝেই বুকের সমস্যা হয়। এরূপ হলে গুটি বের হলেও জ্বর কমে না। ১০২°-১০৪° ফারেনহাইট জ্বর থাকে।

- **জল বসন্তের গুটি ঃ** এক সময় সব স্তরের গুটি দেখা যায়। গুটিগুলো গুচ্ছে গুচ্ছে বেরোয়। বুকে পিঠে বেশী বেরোয়। পরে গুটি শুকোলে কোন দাগ থাকে না।

৪. পরীক্ষা

ইউরিন আর/ই, হিমোগ্লোবিন%, টি.সি, ডি.সি, ই.এস.আর, উইডাল টেস্ট, ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট টেস্ট করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- এই রোগে চিকিৎসা তত প্রয়োজন হয় না। পরে অন্যান্য কমপ্লিকেশন বিশেষ করে বুক ও পেটের কমপ্লিকেশন থাকলে সেপট্রান বা এভলোট্রিন ডি.এস দিতে হবে ১টি করে ২বারে ৫দিন। গুটি শুকিয়ে এলে এতে লোশন ক্যালামাইন লাগালে ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যায়। জিঙ্ক অক্সাইড, বোরিক ও ক্যালামাইন পাউডার মিশিয়ে পাউডার লাগানো যায়।
- সেকেন্ডারী ইনফেকশন থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেরক্স-এ (সেফুরক্সিম) ২৫০ মিগ্রা অথবা ৫০০ মিগ্রা এর ১ টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার করে ৭-১০ দিন বা এভলোমক্স (এমোক্সিসিলিন) দিনে ২ বার বা অন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা চলে এই সঙ্গে।

৬. উপদেশ

- রোগীকে পৃথক ঘরে মশারীর মধ্যে শুইয়ে রাখতে হবে।
- করলা পাতার রস রোজ ২ বার করে খেতে দিলে উপকার হয়।
- রোগীর পোশাক পরিচ্ছদ ও বিছানা পৃথক রাখতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে।
- গুটি ঠিকমত বের না হলে স্পঞ্জ করা দরকার। তাতে গুটি সব বের হয়ে যায়।
- রোগী যাতে গা-হাত-পা চুলের গুটি না গলিয়ে ফেলে সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য।
- সাগু, বার্লি, হরলিক্স, দুধ, গ্লুকোজ, ফলের রস প্রভৃতি পথ্য দিতে হবে। গুটি শুকিয়ে গেলে মাছ, ডিম, ছানা ইত্যাদি প্রোটিন প্রয়োজন।
- রোগীর ঘর ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, লাইজল প্রভৃতি দিয়ে জীবাণুশূণ্য করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

টনসিলের প্রদাহ

১. কি?

মুখের ভিতর ফারিংস এর দুপাশের দেয়ালে দুটি টনসিল গ্ল্যান্ড থাকে। বিশেষ করে মুখ বড় করে হাঁ করলে জিহ্বার শেষ প্রান্তের পার্শ্বে টনসিলের অবস্থান। এর উপরিভাগ মিউকাস মেমব্রেন নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। টনসিল গ্ল্যান্ডর যে রস নিঃসৃত হয় সেই রসে লিম্ফসাইট থাকে। ফলে মুখের ভিতর আত্মরক্ষা এর বিশেষ কাজ। যদি কোনভাবে এর স্বাভাবিক নিঃসরণ বন্ধ হয় অথবা কোন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা প্রদাহ জনিত অবস্থা সৃষ্টি হলে টনসিলাইটিস রোগ হয়।

২. কারণ

আমাদের মুখ গহ্বর জীবাণুর ভান্ডার। বিশেষ করে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জীবাণু সার্বক্ষণিক থেকেই যায়। অনেক সময় ঠান্ডা বা আবহাওয়ার তারতম্যে জীবাণু গুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং টনসিল গ্ল্যান্ড দু'টি আক্রান্ত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে। যাদের মুখের ভিতর প্রতিনিয়ত পরিস্কার থাকে না, প্রায়ই সর্দিকাশি বা অন্যান্য রোগে ভোগে তাদের এটা বেশি হয়।

৩. লক্ষণ

- গলার ভিতর ব্যথা করে, ঢোক বা খাদ্য গিলবার সময় ব্যথা করে এবং কষ্ট হয়।

টনসিল দু'টি আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং লাল বর্ণ ধারণ করে।
টনসিল গ্ল্যান্ডের উপরের আলপিনের মাথার মত হলদে রং এর দাগ ও গুটিগুলো বড় দেখা যায়

- শরীরে ১০০°-১০১° ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বর ওঠে।
- টনসিল দু'টি আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং লাল বর্ণ ধারণ করে
- টনসিল গ্ল্যান্ডের উপরের আলপিনের মাথার মত হলদে রং এর দাগ ও গুটিগুলো বড় দেখা যায়।
- রোগের তীব্রতায় গ্ল্যান্ডগুলো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্নতা সৃষ্টি করে।
- শরীরের অন্যান্য স্থানের গ্রন্থিগুলোও ফুলে যায়।

৪. পরীক্ষা

- পুঁজের কালচার সেনসিটিভিটি টেষ্ট করতে হবে।
- লাইট দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

৫. চিকিৎসা

- ট্যাবলেট এমব্রোক্সল ২৫০ মিগ্রা ১টি করে দিনে ৩ বার ৭-১০ দিন সেব্য।
- ক্যাপসুল এভলোমক্স (এমোক্সিসিলিন) ২৫০ মিগ্রা ১টি দিনে ৩ বার ৭-১০ দিন সেব্য, অথবা

  এভলোমক্স (এমোক্সিসিলিন) সাসপেনশন ১-২ চামচ দিনে ৩ বার ৫-৭ দিন সেব্য, অথবা
- ইঞ্জেকশন এভলোমক্স (এমোক্সিসিলিন) ২৫০ ও ৫০০ মিগ্রা। তিব্রতা অনুসারে ১টি ভয়েল ৮ ঘন্টা পর পর মাংসপেশীতে বা শিরা পথে দিতে হবে।

অথবা,

- ক্যাপসুল এভলোসেফ (সেফরাডিন) ২৫০ অথবা ৫০০ মিগ্রা ১ টি করে ৬ ঘন্টা পরপর দিনে ৪ বার সেব্য, অথবা

  এভলোসেফ (সেফরাডিন) সাসপেনশন ১-২ চামচ ৬ ঘন্টা পরপর দিনে ৪ বার সেব্য।
- গলার ব্যথা ও জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ঃ

  ট্যাবলেট এক্সেল (প্যারাসিটামল) ৫০০ মিগ্রা
  ১ টি করে দিনে ৩ বার সেব্য, অথবা

  সিরাপ এক্সেল (প্যারাসিটামল) ১২০ মিগ্রা/৫মিলি
  ২-৩ চামচ দিনে ৩ বার সেব্য।

অথবা,

- ব্যথার তীব্রতা বেশি হলে ডাইক্লোফেনাক পটাশিয়াম জাতীয় ঔষধ।

  ট্যাবলেট মোবিফেন (ডাইক্লোফেন) ২৫ ও ৫০ মিগ্রা
  ১ টি করে দিনে ৩ বার ভরাপেটে সেব্য
- ভিটামিন-সি জাতীয় ঔষধ ঃ
  ট্যাবলেট নিউট্রিভিট সি ১ টি করে দিনে ৩ বার খাবার পর চুষে খেতে হবে।
- প্রচুর লবন মিশিয়ে গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়।
- সর্দিকাশি থাকলে ক্লোরফেনিরামিন মেলিয়েট জাতীয় ঔষধ।
  ট্যাবলেট এসিট্রিন
  ১ টি করে দিনে ২-৩ বার সেব্য, অথবা
  সিরাপ এসিট্রিন
  ১-২ চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।
- অন্যান্য অসুবিধা থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।
- চিকিৎসা বিশেষ উন্নতি না হলে অপারেশন করানোই উত্তম।

৬. হার্বাল চিকিৎসা

- সামান্য পরিমাণ বেডেলার মূলের ছাল মধুর সাথে মিশিয়ে ঘরে রাখতে হবে। সারাদিনে ৮-১০ বার থেতো করে চিবিয়ে খেলে উপকার হবে।

৭. উপদেশ

- তরল নরম উষ্ণ খাদ্য গ্রহন করা উচিত।
- দাঁত ও মুখ প্রতিবার খাবার গ্রহনের পর পরিস্কার রাখতে হয়।
- উষ্ণ বিছানা ও কান ঢেকে গরম রাখা উচিত।
- চিকিৎসায় সুবিধা না হলে বা বারবার রোগের বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে অপারেশন করে নেয়া ভালো।

ইন্‌জেকশন দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ

শরীরের মধ্যে সূচ ফুটিয়ে তার মাঝ দিয়ে দেহের ভেতরে বা রক্তপ্রবাহে ঔষধ প্রয়োগকে ঔষধ পুশ করা বা সোজা কথায় ইন্‌জেকশন দেওয়া বলা হয়।

ইন্‌জেকশন সিরিঞ্জের প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। তা হলো- ব্যারেল, পিস্টন ও নিডল

ইন্‌জেকশন সিরিঞ্জের প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। তা হলো-

১. **ব্যারেল** (Barrel) বা বাইরের অংশ। এতে সি.সি. বা কিউবিক সেন্টিমিটার এবং ml অর্থাৎ মিলিমিটার অনুযায়ী দাগ কাটা থাকে।

২. **পিস্টন** (Piston)- যার সাহায্যে ঔষধ সিরিঞ্জে টেনে নেওয়া এবং দেহে পুশ করা হয়।

৩. **নিডল** (Needle)- এটি ফুটিয়ে ঔষধ দেহে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। এই সূচের ভেতর আগাগোড়া ছিদ্র থাকে- অর্থাৎ সূচটি আগাগোড়া ফাঁপা।

এছাড়া অনেক সময় সূচ পরানোর সুবিধার জন্য ব্যারেলের আগায় Adopter লাগানো হয়।

পিস্টন সাধারণত দুই ধরনের হয়। সবটাই কাচ বা All Glass অথবা ধাতুর তৈরি বা Metal Piston.

আজকাল এইডস্ রোগ প্রভৃতি থেকে বাঁচবার জন্য Dispo সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয়। এগুলি কম দামী পলিথিন নির্মিত। ইন্‌জেকশন করেই সিরিঞ্জটি ফেলে দেওয়া হয়। প্রতিটি ইন্‌জেকশনে নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহৃত হয়।

১. চামড়ার ঠিক নিচে ইন্‌জেকশন দিলে তাকে বলে সাবকিউটেনিয়াস (Subcutaneous) ইন্‌জেকশন।

২. পেশীতে ইন্‌জেকশন দিলে তাকে বলে ইন্ট্রামাসকুলার (Intramuscular-IM) ইন্‌জেকশন।

৩. শিরার মধ্যে ইন্‌জেকশন দিলে তাকে বলে ইন্ট্রাভেনাস (Intravenous-IV) ইন্‌জেকশন।

৪. প্রত্যক্ষভাবে বুকের পঞ্চম ইন্টারকস্টাল স্পেস দিয়ে হার্টে ইন্‌জেকশন দিলে তাকে বলে ইন্ট্রাকার্ডিয়াক ইন্‌জেকশন। হঠাৎ হার্ট ফেল করলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ইন্ট্রাকর্ডিয়াক অ্যাড্রেনালিন প্রয়োগ করা হয়।

৫. লাম্বার পাংচার করে ইন্ট্রাস্পাইন্যাল্ (Intraspinal) ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। এই ইন্‌জেকশন করা হয় শিরদাড়া বা মেরুদন্ডের মধ্যে অর্থাৎ 4^{th} ও 5^{th} লাম্বার ভার্টিব্রার মধ্যে।

৬. ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল (Intra Peritoneal Injection) এটি করা হয়, পেটের ভেতরের Peritoneal Cavity এর Peritoneum এর মধ্যে।

ইন্‌জেকশন দিতে গেলে আগে সিরিঞ্জের সঙ্গে Needle টি লাগিয়ে তা ভালভাবে Alcohol Wash করতে হয়। তারপর পিস্টনটি খুলে সিরিঞ্জটি শুকিয়ে নিতে হবে নাড়াচাড়া করে। তারপর সিরিঞ্জে ঔষধ ভরতে হবে। অ্যাম্পুলটি ভেঙ্গে তার মধ্যে ঔষধ ধীরে ধীরে ভরতে হয়। যদি Vial হয়, তা হলে কিছুটা বাতাস সিরিঞ্জে নিয়ে তা Vial-এ পুশ করে দিতে হয়। তারপর টানলে ধীরে ধীরে ঔষধ সিরিঞ্জে প্রবেশ করবে।

এরপরে যে স্থানে ইন্‌জেকশন করতে হবে, ঐ স্থানটিতে কিছু স্পিরিট বা অ্যালকোহল তুলোতে লাগিয়ে স্থানটি ঘষে নিতে হবে। Subcutaneous বা Intramuscular হলে শিরা, ধমনী বাদ দিয়ে সূচটি প্রবেশ করাতে হবে।

সূচ প্রবেশ করাবার আগে সব তরল ঔষধ উপরের দিকে নিতে হবে এবং দেখতে হবে যেন সিরিঞ্জে একটিও বুদবুদ (Air bubble) না থাকে।

যে ধরনের ইন্‌জেকশন সেই অনুযায়ী গভীরে সূচ প্রবেশ করিয়ে পিস্টনটিতে চাপ দিয়ে সিরিঞ্জের ঔষধ পুশ করে সূচটি বের করে নিয়ে ঐ স্থানটি আবার অ্যালকোহল দিয়ে ঘষে দিতে হবে।

এবারে বিভিন্ন ধরনের ইন্‌জেকশন সম্পর্কে বলা হচ্ছে। মনে রাখা কর্তব্য Subcutaneous and IM ইন্‌জেকশনই বেশি হয়। তার চেয়ে কম হয়, IV ইন্‌জেকশন। অন্য ধরনের ইন্‌জেকশন আরও কম হয়।

সাবকিউটোনিয়াস ইন্‌জেকশন

শরীরের যে সব জায়গায় চামড়া নরম বা Loose থাকে, ঐ সব স্থানে এই ইন্‌জেকশন দিতে হয়। তবে ঔষধটি পড়বে চামড়ার ঠিক নিচে অর্থাৎ পেশীর উপরে এটি পড়বে।

পেশী পর্যন্ত ঔষধ পৌছাবে না এতে। এখানে একটি ছবির দ্বারা কি করে এই ইন্‌জেকশন দিতে, তার পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে।

দেহের যে সব স্থানে চামড়ার নিচে অনেক ঢিলা বা নরম সেলুলার টিস্যু থাকে সেই সব স্থানে সাবকিউটোনিয়াস ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়

দেহের যে সব স্থানে চামড়ার নিচে অনেক ঢিলা বা নরম সেলুলার টিস্যু থাকে সেই সব স্থানে এটি দেওয়া হয়। পেটে, উরুতে, বাহুর উপরের দিকে চামড়ার নিচে, এটি দিতে হয়।

ইন্‌জেকশন দেবার আগে বাম হাত দিয়ে চামড়াটা টেনে নিতে হবে। তারপর ডান হাত দিয়ে Needle ফোটাতে হবে। সূচ এমনভাবে ফোটাবে যাতে তা পেশী পর্যন্ত না যায়। সূচ ফুটিয়ে বাম হাত দিয়ে পিস্টনটি ঠেলতে হবে।

শরীরের যে সব স্থানে শিরা আছে বা প্রদাহ আছে, ঐ সব স্থানে ইন্‌জেকশন দিতে নেই। সূচ ফোটাবার আগে দেখতে হবে যে, ঔষধের মধ্যে যেন কোনও Air Bubble না থাকে।

ইন্ট্রামাসকুলার ইন্‌জেকশন

গ্লুটিয়্যাল পেশীতে বা বাহুর উপরের অংশ ডেল্টয়েড পেশীতে এই ইন্‌জেকশন দিতে হয়। যে পেশীতে ইন্‌জেকশন দিতে হবে, সেই স্থান হেক্সিসল দিয়ে মুছে দিয়ে ইন্‌জেকশন দিতে হয়। প্রায় পুরো সূচটি প্রবেশ করাতে হবে যাতে চামড়া ভেদ করে পেশীর মধ্যে ঔষধটি পড়ে।

এই ইন্‌জেকশন দেবার সময় সূচটি চামড়ার সঙ্গে প্রায় লম্বাভাবে 60-70 ডিগ্রি কোণ করে অবস্থান করবে। সাবধান থাকতে হবে, যাতে সূচটি ভেতরে গিয়ে শিরা, ধমনী বা নার্ভকে স্পর্শ না করে

এই ইন্‌জেকশন দেবার সময় সূচটি চামড়ার সঙ্গে প্রায় লম্বাভাবে 60-70 ডিগ্রি কোণ করে অবস্থান করবে। সাবধান থাকতে হবে, যাতে সূচটি ভেতরে গিয়ে শিরা, ধমনী বা নার্ভকে স্পর্শ না করে।

সূচটি ঢুকিয়ে পিস্টন খুব হালকাভাবে একটু Back Push করে দেখতে হবে শিরা প্রভৃতি ভেদ করছে কিনা।

যদি সূচ শিরা ভেদ করে, তা হলে সূচ দিয়ে এক ফোটা রক্ত ঔষধের মধ্যে প্রবেশ করবে। তখন ঔষধ Push না করে সূচ টেনে বের করে নিতে হবে।

এইভাবে ঔষধ Push করে সূচ বের করে স্থানটি হেক্সিসল ভেজানো তুলো দিয়ে ধীরে ধীরে ডলে দিতে হবে। বাহু বা গ্লুটিয়াল পেশীতে কিভাবে ইন্ট্রামাসকুলার ইন্‌জেকশন দিতে হয়, তা ছবিতে ভালোভাবে দেখানো হয়েছে। গ্লুটিয়াল পেশীতে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় Middle of the anterior third of gluteal region অথ্যাৎ বাইরের দিকের অংশের মাঝখানে এটি দিতে হবে।

ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন

এই ইন্‌জেকশন হাতের কনুইয়ের ঠিক সামনের শিরা বা vein এ দেওয়া হয়।

অনেক রোগ আছে, যেখানে দ্রুত ঔষধের কাজ চাই। সেই সময়ে এন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন দেবার প্রয়োজন হয়, যাতে ঔষধ দ্রুত রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

হাতের কনুইয়ের সামনে যে শিরায় এই ঔষধ দেওয়া হয়, তাকে বলে বেস্যালিক (basilic) ভেন। রোগী রোগা বা দোহারা চেহারা হলে, সহজে এই শিরা দেখা যায় এবং ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। কিন্তু রোগী মোটা হলে এই শিরা স্পষ্ট দেখা নাও যেতে পারে। রোগী মোটা হলে, কনুইয়ের অনেকটা উপরে চাপ দিয়ে বা রবারের টিউব দিয়ে বেধে শিরা ফুলিয়ে নিতে হয়। কিন্তু সুচ ফুটিয়ে সিরিঞ্জের ঔষধে রক্তবিন্দু প্রবেশ করলে তারপর ঐ বাধন খুলে ঔষধ পুশ করতে হবে।

রোগীকে শুইয়ে তার সম্পূর্ন বাহুটি খুলে রাখতে হবে। রোগীর হাতটা একটা বালিশের উপরে রাখলে ভাল হয়। ইন্‌জেকশন স্থানটি যথারীতি তুলো এবং হেক্সিসল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ভেনটিকে ফোলাবার জন্যে একজন সহকারী হাত দিয়ে চেপে ধরবে অথবা রবার টিউব দিয়ে বেধে দিতে হবে। সূচটি চামড়ার সঙ্গে সমান্তরালে রেখে আস্তে আস্তে চামড়া ভেদ করে ভেনের মধ্যে সাবধানে প্রবেশ করাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে রোগীর শিরার একটিমাত্র দেওয়াল ফুটো হয়, যেন দুফোড় না হয়। তাই সুরু সূচ (২০ থেকে ২৪নং) ব্যবহার করা উচিত।

পুশ করার আগে দেখতে হবে, ভেনের রক্ত সিরিঞ্জে আসছে কিনা। রক্ত এলে বুঝতে হবে, ঠিক আছে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সুচ শিরার ভিতরের প্রাচীর ভেদ না করে।

ঔষধের মধ্যে এক ফোটা রক্ত প্রবেশ করলে বোঝা যাবে, ঠিকমত ফোটানো হয়েছে। তারপর পুশ করার আগে হাতের চাপ বা বাধন খুলে দিতে হবে। এর পরে ধীরে ধীরে পুশ করতে হবে। কখনো জোরে চাপ দিতে নেই।

ঔষধটি ধীরে ধীরে রক্তে মিশে যাবে। রক্তপ্রবাহে না মেশা পর্যন্ত পুশ করা উচিত নয়। আর সব সময় রক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সূচ ফোটাবার আগে কোনও বাতাস সিরিঞ্জে না থাকে।

পুশ করা হয়ে গেলে, হেক্সিসল ভেজানো তুলো দিয়ে জায়গাটা ধরে সূচটি বের করে নিতে হবে। তারপর ঐ তুলো সহ কনুই কিছুক্ষণ ভাজ করে রাখতে হবে।

রোগী মোটা হলে এই শিরা স্পষ্ট দেখা নাও যেতে পারে। তখন কনুইয়ের অনেকটা উপরে চাপ দিয়ে বা রবারের টিউব দিয়ে বেধে শিরা ফুলিয়ে নিতে হয়

যদি ঔষধের শেষে কোনও তলানি বা বুদবুদ থাকে, তা হলে ঐ ঔষধ পুশ করা উচিত নয়। তার আগেই সূচটি বের করে আনতে হবে। ক্যালসিয়াম, গ্লুকোজ, স্যালাইন প্রভৃতি ইন্ট্রাভেনাস দিতে হয়।

ইন্ট্রাস্পাইন্যাল ইন্‌জেকশন

এই ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় শিরদাঁড়া বা মেরুদন্ডের মধ্যে। চতুর্থ ও পঞ্চম লাম্বার ভার্টিব্রার মধ্যে এটি দেওয়া হয়।

রোগীকে পাশ ফিরিয়ে একটু কাত করে শোয়াতে হয়। তারপর তার পিঠের থেকে দুটি ইলিয়াক ক্রেস্টের সর্বোচ্চ পয়েন্ট বের করতে হবে। দুটি ক্রেস্টের স্থলে একটি লাইন বা রেখা দিয়ে যোগ করতে হবে।

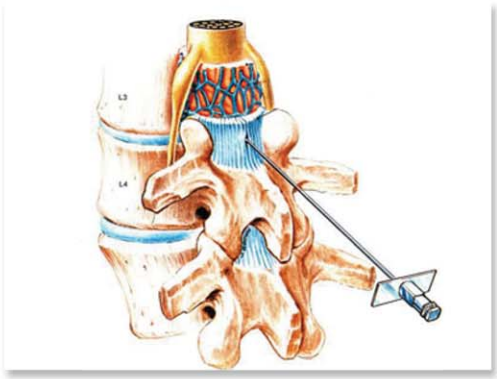

এই ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় শিরদাঁড়া বা মেরুদন্ডের মধ্যে। চতুর্থ ও পঞ্চম লাম্বার ভার্টিব্রার মধ্যে এটি দেওয়া হয়

এই লাইনটিই চতুর্থ ও পঞ্চম লাম্বার ভার্টিব্রার ঠিক মাঝখান দিয়ে যায়। স্পাইনের ঐ জায়গাটির পাশের চামড়া ভাল করে হেক্সিসলে ভেজানো তুলো দিয়ে স্টেরিলাইজ করে নিতে হবে।

তারপর একটি মোটা ক্যালিবারের (স্থুলগর্ভ) সূচ ভাল করে স্টেরিলাইজ কার চামড়ার সঙ্গে সমকোণ করে চতুর্থ লাম্বার ভার্টিব্রার ঠিক নিচেকার ফাঁকে বিদ্ধ করতে হবে।

বোঝাবার সুবিধার জন্য এখানে মানব দেহের মেরুদন্ডের একটি চিত্র দেওয়া হলো।

এটি বিদ্ধ করে ভেতরে ও সামান্য উধ্বদিকে দুটি ভার্টিব্রার মাঝখানে প্রবেশ করালে তা মেরুদন্ডের মধ্যে যাবে।

এই ক্যানাল চামড়ার দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি ভিতরে থাকে। হাড়ে ঠেকলে টেনে নিয়ে আবার চেষ্টা করতে হবে। সূচটি ভেতরের ক্যানেলে প্রবেশ করলে সুচটির ভেতরে দিয়ে মেরুদন্ডের মাঝের রস বেরিয়ে আসতে থাকবে। যদি রক্ত বের হয়, তা হলে বুঝতে হবে শিরা বা vein বিদ্ধ হয়েছে। তা হলে খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় বিদ্ধ করতে হবে।

যে পরিমাণ ঔষধ দিতে হবে, তার চেয়ে বেশি সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড বের করে নিতে হয়। সাধারণত ৫ ml. ঔষধ যদি ইন্‌জেকশন করতে হয় তা হলে ১০ থেকে ১৫ মি.লি ফ্লুইড বের করে নিতে হয়। অনেক সময় চাপ কমাবার জন্য আরও বেশি ফ্লুইড বের করা হয়।

ঔষধ ভর্তি সিরিঞ্জটি ঈষৎ গরম পানিতে ডুবিয়ে তারপর নিডলের সঙ্গে লাগিয়ে ইনজেক্ট করতে হয়। অনেক সময় সিরিঞ্জ পানিতে গরম করে ঔষধ ভরা হয়।

ইন্‌জেকশন দেবার পর পর খাটের পায়া পায়ের দিকে উচু করে দিতে হবে যাতে মাথা নিচে ও পা উপরে থাকে। তার ফলে ঔষধটি দ্রুত শোষিত হয়ে যায়।

সাধারণত মেনিনজাইটিস, টিটেনাস প্রভৃতি রোগে এইভাবে লাম্বার পাংচার করার প্রয়োজন হয়। **তবে অ্যানাটমি ভালভাবে না জানা থাকলে এই ইন্‌জেকশন দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল।**

ইন্‌জেকশনের সুবিধা

মুখে ঔষধ প্রয়োগ করার চেয়েও ইনজেকশনে ঔষধ প্রয়োগের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। যেমন-

১. এতে প্রত্যক্ষ রক্তপ্রবাহে ঔষধ মিশে যায়। তাই এতে দ্রুত কাজ হয়।

২. অনেক সময় বমি হয় বা ঔষধ পেটে থাকে না। তখন ইনজেকশনে খুব সুবিধা হয়ে থাকে।

৩. এতে শরীরের প্রয়োজনীয় ঔষধ দিলে তাতে রোগের উপশম সত্বর বুঝতে পারা যায়।

অসুবিধা

১. সব ঔষধ এভাবে দেওয়া যায় না।

২. ব্যথা হতে পারে।

৩. শিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক ছাড়া ব্যবহার করা যায় না।

পাইলস

পাইলস রোগটি হাজার বছর ধরে পরিচিত। খুব কম লোকই আছেন যারা এ রোগের নাম জানেন না। পাইলস হচ্ছে মলদ্বারের ভেতরে ফুলে ওঠা শিরাযুক্ত মাংসপিন্ড বা ভাসকুলার কুশন। সব মানুষেরই এই কুশন আছে যা কিনা মল ত্যাগের সময় মলদ্বারের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন এটি কোনো উপসর্গ সৃষ্টি করে তখনই আমরা বলি পাইলস বা হেমোরয়েড। গ্রামবাংলায় বলে গেজ রোগ। পাইলস শব্দটি প্রচলন হয় ১৩৭০ সাল থেকে, এর উৎপত্তি লাতিন শব্দ থেকে। পাইলসের আর একটি পুরনো নাম হচ্ছে হেমোরয়েড, যার উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Haema বা রক্ত এবং Rhoos বা প্রবাহিত। এই শব্দটির উৎপত্তির ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। হিপোক্রেটস প্রথম এই নামটি ব্যবহার করেন। নাম দেখেই এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলো অনুমান করা যায়।

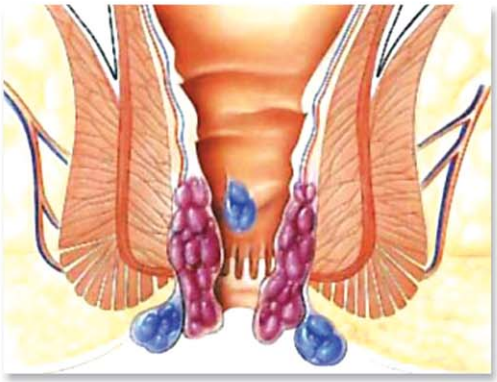

পাইলস হচ্ছে মলদ্বারের ভেতরে ফুলে ওঠা শিরাযুক্ত মাংসপিন্ড বা ভাসকুলার কুশন। সব মানুষেরই এই কুশন আছে যা কিনা মল ত্যাগের সময় মলদ্বারের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন এটি কোনো উপসর্গ সৃষ্টি করে তখনই আমরা বলি পাইলস

উপসর্গগুলো কী কী ?

পাইলসের প্রধান দুটি উপসর্গ হচ্ছেঃ ১. মলদ্বার থেকে তাজা রক্ত যাওয়া ২. মলদ্বারের বাইরে মাংসপিন্ড ঝুলে পড়া। এছাড়াও অন্য উপসর্গগুলো হচ্ছে- ক. মলদ্বারে চুলকানো খ. মলদ্বার থেকে মিউকাস বা আম নিশ্রিত হওয়া গ. মলদ্বারে ব্যথা বা জ্বালাপোড়া।

পাইলসের কারণ ও শ্রেণীবিন্যাস

পাইলসের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- কোষ্ঠকাঠিন্য, পায়খানায় অতিরিক্ত কোত বা অনিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস, ডায়রিয়া, গর্ভাবস্থা, কম আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ ইত্যাদি।

পাইলসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়

- বহিস্থিত পাইলসঃ এ ক্ষেত্রে ফোলাটি থাকে মলদ্বারের বাইরে।
- অভ্যন্তরীণ পাইলসঃ এ ক্ষেত্রে ফোলাটি সাধারণত মলদ্বারের ভেতর থাকে কিন্তু বাইরেও ঝুলে পড়তে পারে।

অভ্যন্তরীণ পাইলসকে আবার বিভিন্ন ডিগ্রি অনুযায়ী ভাগ করা যায় যেমন-

১. প্রথম ডিগ্রি পাইলসঃ পাইলস সব সময় মলদ্বারের ভেতরে থাকে।

২. দ্বিতীয় ডিগ্রি পাইলসঃ পাইলসটি বাইরে ঝুলে পড়ে কিন্তু আপনা আপনি ভেতরে চলে যায়।

৩. তৃতীয় ডিগ্রি পাইলসঃ পাইলসটি বাইরে ঝুলে থাকে কিন্তু হাত দিয়ে চাপ দিলে ভেতরে ঢুকে যায়।

৪. চতুর্থ ডিগ্রি পাইলসঃ পাইলসটি বাইরে ঝুলে পড়ে কিন্তু সহজে ভেতরে ঢুকানো যায় না।

পাইলসের চিকিৎসা

পাইলসের চিকিৎসার প্রচলন বহু আগ থেকেই। ২৫ খ্রিস্টপূর্বে পাইলসের লাইগেশন পদ্ধতির বর্ণনা দেন ক্যালসাস নামে এক রোমান চিকিৎসক। ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সভ্যতার সময় পাইলস এর চিকিৎসায় রাবার ব্যান্ড পদ্ধতির মতো লাইগেশনের বর্ণনা পাওয়া যায় Hippocrates এর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইয়ে।

যাই হোক, পাইলসের যে কোনো চিকিৎসার আগে সিগময়ডোসকপি বা কলোনোস্কপি করে নেয়া প্রয়োজন কারণ পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাওয়ার একমাত্র কারণ পাইলস, না অন্যকিছু। এটি নিশ্চিত হওয়ার পরই চিকিৎসা করা যুক্তিযুক্ত। পাইলসের চিকিৎসা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা সম্ভব। যেমনঃ মলদ্বার না কেটে বা বিনা অপারেশনে মলদ্বার কেটে বা অপারেশনের মাধ্যমে। মলদ্বার না কেটে বা বিনা অপারেশনে, পাইলস চিকিৎসার মধ্যে একটি হচ্ছে এই ব্যান্ডিং বা রিং-লাইগেশন পদ্ধতি, আরেকটি হচ্ছে- ইনজেকশন পদ্ধতি। অপরদিকে অপারেশন পদ্ধতিতে মলদ্বারের চতুর্দিকে তিনটি জায়গায় কেটে পাইলসের চিকিৎসা করা হয়। অতি সম্প্রতি স্বয়ংক্রিয় আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে মলদ্বারের অনেক গভীরে কেটে পাইলস অপারেশন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, যাতে মলদ্বারে কোনো ক্ষত থাকে না। এ পদ্ধতির নাম Longo বা Stapled Haemorrhoidectomy। ১৯৬৩ সালে জে ব্যারন বহির্বিভাগ পদ্ধতি হিসেবে পাইলসের ব্যান্ডিংয়ের প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিতে একটি চিমটার সাহায্যে পাইলসকে টেনে ধরে রাবার ব্যান্ড পরিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে পাইলসের মাংসপিন্ডে রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয় এবং পাইলসের ফুলা মাংসপিন্ডটি কুচকে যায়। এই পদ্ধতিতে মলদ্বারে কোনো কাটাছেড়া ছাড়াই পাইলসের চিকিৎসা করা সম্ভব। রোগীকে অবশ বা অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না এবং কোনো পূর্বপ্রস্তুতির দরকার নেই। চিকিৎসা শেষে রোগী হেঁটে বাড়ি চলে যেতে পারেন।

সময়ের বিবর্তনে এখন অনেক উন্নত অত্যাধুনিক ব্যান্ড লাগানোর যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে যন্ত্রের সাহায্যে সেকশন-এর মাধ্যমে টিস্যু টেনে ধরা হয় এবং ব্যান্ড পরিয়ে দেয়া হয়। অতি সম্প্রতি আরেকটি অত্যাধুনিক ব্যান্ড লাগানো যন্ত্র বেরিয়েছে যাতে আগে থেকেই যন্ত্রে ব্যান্ড পরানো থাকে। যন্ত্রটি সাকশন মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করে শুধু ট্রিগার টিপলেই ব্যান্ডটি নির্দিষ্ট স্থানে লেগে যায়। এই যন্ত্রটি অত্যন্ত আধুনিক এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে সফলতা প্রায় ৯৭ ভাগ। এই যন্ত্রের বিশেষত্ব হলো অল্প সময়ে এবং কম লোকবলে ব্যান্ডিং সম্পন্ন করা যায়।

কাদের জন্য ব্যান্ডিং প্রযোজ্য ?

সব ধরনের পাইলস রোগীর ক্ষেত্রে ব্যান্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তবে প্রথম, দ্বিতীয় ও কিছু ক্ষেত্রে তৃতীয় ডিগ্রী পাইলসে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়। যেসব রোগী রাবার এলার্জি বা রক্ত জমাট রোধের চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন তাদের এই চিকিৎসা দেয়া নিষেধ।

চিকিৎসা-পরবর্তী উপদেশ

ব্যান্ডিংয়ের পর পায়খানার সঙ্গে অল্প রক্ত যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এই চিকিৎসার পর কয়েক সপ্তাহ পায়খানা নরম হওয়ার জন্য নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য পরিহার করতে হবে।

জটিলতা

এই পদ্ধতিতে জটিলতা আশঙ্কা নেই বললেই চলে। তবে সঠিকভাবে ব্যান্ড প্রয়োগ না করলে ব্যান্ড খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি ব্যান্ড খুব নিচে প্রয়োগ করা হয় তবে মলদ্বারে ব্যথা হতে পারে। তাই দক্ষ হাতে এটির প্রয়োগ হলে কোনো ধরনের জটিলতার আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য

রক্ত পরীক্ষাঃ কিছু তথ্য

রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা একটি ভালো হাতিয়ার। শরীরের রক্ত হলো নানা ধরনের কোষের সমষ্টি, আর অন্যান্য যৌগিক বস্তু, যেমন- বিভিন্ন ধরনের লবন, প্রোটিন ইত্যাদিও থাকে। এগুলোর প্রতিটিরই প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এদের স্বল্পতা বা আধিক্য সমস্যা নির্দেশ করে। রক্তের তরল অংশকে বলা হয় প্লাজমা। যখন শরীরের বাইরে রক্ত জমে যায়, তখন রক্তের কোষগুলো এবং কিছু কিছু প্রোটিন শক্ত হয়ে যায়। যে তরল পড়ে থাকে সেটাকে বলা হয় সিরাম। এ সিরামও নানা পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়।

নানাভাবে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। কতটা রক্ত লাগবে বা তার কোন অংশ লাগবে সেটা নির্ভর করছে কি পরীক্ষা তা দিয়ে করা হবে তার ওপর

নানাভাবে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। কতটা রক্ত লাগবে বা তার কোন অংশ লাগবে সেটা নির্ভর করছে কি পরীক্ষা তা দিয়ে করা হবে তার ওপর। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্ত-শর্করা মাপার জন্য কয়েক ফোঁটা রক্ত আঙ্গুলের ডগায় ছুঁচ ফুটিয়ে নিলেই যথেষ্ট। আবার সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষার জন্য বেশকিছুটা রক্তের প্রয়োজন হয়, যা সাধারণত হাতের কনুইয়ের সামনের ভাঁজের শিরা থেকে নেয়া হয়।

Complete Blood Count (CBC) বা সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা থেকে রক্তের বিভিন্ন সেল বা কণিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এ পরীক্ষার ফলাফল থেকে যার রক্ত পরীক্ষা হয়েছে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। তার কোনো রোগ হয়ে থাকলে বা কোনো উপসর্গ থাকলে সেগুলোর কারণ কি, তা বহুক্ষেত্রেই বের করা যায়।

আমাদের রক্তে নানা রকমের কণিকা থাকে, যেমন- শ্বেতকণিকা, লোহিতকণিকা ও প্ল্যাটিলেট। প্রত্যেকেই আমাদের দেহকে সুস্থ রাখতে নানাভাবে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষায় সাধারণত তাদের সম্পর্কে এ তথ্যগুলো থাকে-

রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা

শ্বেতকণিকা আমাদের শরীরকে অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রক্ষা করে। যদি দেহে কোনো রোগের সংক্রমন হয়, তাহলে দেহের শ্বেতকণিকা সেই সংক্রমণের জন্য দায়ী জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে।

আকৃতিতে শ্বেতকণিকা লোহিতকণিকার থেকে বড় হয় এবং সংখ্যাতেও তারা কম হয়। দেহে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন হয়, তাহলে শ্বেতকণিকার সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। শ্বেতকণিকার সংখ্যা থেকে সংক্রমণের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সময় বিশেষে এগুলো অন্যান্য তথ্যও চিকিৎসককে দেয়। যেমন- ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় এর সংখ্যা থেকে চিকিৎসার কার্যকারিতা আঁচ করা যায়।

শ্বেতকণিকার রকমভেদ

বিভিন্ন ধরণের শ্বেতকণিকা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। এদের মধ্যে নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট, মনোসাইট, ইয়েসিনোফিল এবং ব্যাসোফিল হলো প্রধান। অপরিণত নিউট্রোফিল, যাকে ব্যান্ড নিউট্রেফিল বলা হয়, সেগুলোকে পরীক্ষার সময় গোনা হয়। শরীর রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের শ্বেতকণিকার কমা বা বাড়ার ওপর নির্ভর করে কি জাতীয় সংক্রমন, বোঝা যায় এটি অ্যালার্জি বা টক্সিনজনিত প্রতিক্রিয়া না লিউকোমিয়া ইত্যাদি।

রক্তের লোহিতকণিকা সংখ্যা

রক্তে লোহিতকণিকার কাজ হলো- ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে শরীরের সব জায়গায় পৌঁছে দেয়া এবং সেখান থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে ফুসফুসে নিয়ে আসা, যাতে ফুসফুস সেগুলো দেহ থেকে বের করে দিতে পারে। লোহিতকণিকার সংখ্যা কম হওয়া অ্যানিমিয়ার লক্ষণ। এর অর্থ শরীর প্রয়োজন মতো অক্সিজেন পাচ্ছে না। লোহিতকণিকার সংখ্যা যদি বেশি বেড়ে যায়, তাহলে ভয় থাকে সেগুলো একসঙ্গে জমাট বেঁধে উপশিরাগুলোর ভেতরকার পথ বন্ধ করে দিতে পারে।

হেমাটোক্রিট

লোহিতকণিকা রক্তের কতটা অংশ (ঘনায়তন বা ভলিউম-এর মাপে) জুড়ে আছে সেটি বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি মাপা হয় শতাংশ বা পার্সেন্টেজ হিসেবে। যদি হেমাটোক্রিট ৪০ বলা হয়, তার মানে রক্তের ঘনায়তনের ১শ' ভাগের ৪০ ভাগ লোহিতকণিকা পূর্ণ।

হিমোগ্লোবিন

লোহিতকণিকার একটি প্রয়োজনীয় অংশ হলো হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনই অক্সিজেনকে বহন করে এবং লোহিতকণিকার রক্তবর্ণের জন্য দায়ী। পরীক্ষায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সাধারণভাবে নির্দেশ করে দেহ কতটা অক্সিজেন পাচ্ছে।

লোহিতকণিকা নির্দেশিকা

লোহিতকণিকার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার জন্য তিন রকম নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়। গড় কণিকার ঘনায়তন, গড় কণিকার হিমোগ্লোবিন এবং গড় কণিকার হিমোগ্লোবিনের গাঢ়করণ। এগুলো একটি যন্ত্রের সাহায্যে এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকে মাপা হয়। MCV থেকে লোহিতকণিকার আয়তন কি বোঝা যায়। MCHC নির্দেশ করে হিমোগ্লোবিন লোহিতকণিকায় কতটা ঘণীভূত অবস্থায় রয়েছে। এই তথ্যগুলো থেকে কি ধরণের অ্যানিমিয়ায় লোকে ভুগছে সেটা বোঝা যায়। লোহিতকণিকাগুলোর আয়তন সব এক হয় না, কম-বেশি থকে। সেটি দেখানোর জন্য অনেক সময় লোহিতকণিকার ব্যাপ্তি বন্টনের উল্লেখও রিপোর্টে থাকে।

প্ল্যাটিলেট বা থ্রম্বোসাইটের সংখ্যা

এগুলো হলো রক্তের ক্ষুদ্রতম কণিকা। রক্তে জমাট বাঁধার ব্যাপারে এগুলোর বড় ভূমিকা আছে। যখন কেটে রক্ত ঝরতে থাকে, তখন এই প্ল্যাটিলেট আকারে খুব বৃদ্ধি পেয়ে একসঙ্গে জমাট বেঁধে একটা আঠার মতো পদার্থে পরিণত হয়। সেটাই কাটা জায়গায় আটকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। প্ল্যাটিলেট খুব কম থাকলে, রক্ত পড়তে শুরু করলে, সেটা বন্ধ হতে চাইবে না। আবার যদি খুব বেশি প্ল্যাটিলেট থাকে, তাহলে দেহের রক্তবাহী নালীগুলোতে জমে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

রক্ত লেপন পরীক্ষা

এতে এক ফোঁটা রক্ত কাচের স্লাইডে ফেলে সেটিকে আরেকটা স্লাইড দিয়ে ঘষে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর এক ধরণের বিশেষ রং দিয়ে সেটিকে রঞ্জিত করা হয। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে রঞ্জিত স্লাইডটি পরীক্ষা করলে রক্তকণিকার অস্বাভাবিক গঠন, আয়তন ইত্যাদি ধরা পড়ে। তা থেকে ম্যালেরিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া ইত্যাদি নানা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অ্যান্টিবডি, শ্বেতকণিকা ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রেটিনের সাহায্যে। যখনই এরা মনে করে দেহে বাইরের কোনো কিছু এসে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করছে (তা ব্যাকটেরিয়াই হোক, বা ভাইরাসই বা অন্যকিছু হোক) এরা গিয়ে তাদের আক্রমণ করে। এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যই আবার অ্যালার্জি হয়। সেটা ঘটে যখন এরা ভুল করে পোলেন, ওষুধ, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদিকে দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে ধরে নেয়। মাঝেমধ্যে এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে শরীরের নিজস্ব কোষগুলোকেই আক্রমণ করতে শুরু করে। এটাও এক ধরণের জটিল অসুস্থতা, যাকে বলা হয় অটো-ইমিউন ডিজিজ।

বাড়তি চিনি

আমরা প্রতিদিন যা খাই এবং পান করি, তার অনেক খাদ্য এবং পানীয়ে অতিরিক্ত চিনি কিংবা বাড়তি কৃত্রিম শর্করা যোগ করা থাকে। মনে করা হচ্ছে, দিনের পর দিন এই বাড়তি চিনিযুক্ত খাদ্য-পানীয় গ্রহন করার ফলে পৃথিবীতে মেদ-ভুঁড়ি এবং অন্যান্য ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা বেড়ে চলেছে। তার মানে, আমরা কি একেবারেই চিনি বা শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করব না? অবশ্যই নয়। স্বাস্থ্যকর অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেই কিছু না কিছু শর্করা থকে। সুষম খাদ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান শর্করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের ফাস্টফুড এবং পানীয়ে যুক্ত বাড়তি চিনি এবং শর্করা। বাড়তি চিনি আমাদের কোন কাজে লাগে না, এটা শুধু খাবারে ক্যালরির মাত্রা বাড়ায়।

আমরা প্রতিদিন যা খাই এবং পান করি, তার অনেক খাদ্য এবং পানীয়ে অতিরিক্ত চিনি কিংবা বাড়তি কৃত্রিম শর্করা যোগ করা থাকে

বাড়তি চিনিযুক্ত খাবারের প্রকৃত পুষ্টিগুণ সামান্যই থাকে। অথচ বাজারের বড় বড় সুদৃশ্য দোকানে সুশোভিত ফাস্টফুড এবং নানা রকম পানীয়, ক্যান্ডি, চুইংগাম, চকোলেট, জ্যাম, জেলিতে বাড়তি চিনি আজ আমাদের স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টির পেছনে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

প্রাকৃতিক কিংবা প্রক্রিয়াজাত যাই হোক না কেন সব শর্করাই শরীরে শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক অনেক খাদ্যে যে শর্করা থাকে তা আমাদের খাদ্যে শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। যেমন- চাল, গম, ভুট্টা, ফলমূল, সব্জি, দুধ। প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন ফাস্টফুড এবং পানীয়ের সঙ্গে যে চিনি যোগ করা হয় তাই বাড়তি চিনি। বাড়তি চিনি যোগ করার অনেক কারণ রয়েছে। এটি-

- ফাস্টফুড এবং পানীয়কে সুস্বাদু করে।
- বেকারির খাবারের বিশেষ রং এবং গঠন দান করে।
- জ্যাম, জেলি প্রভৃতি সংরক্ষণে সাহায্য করে।
- গাঁজন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেঃ ফলে রুটি জাতীয় খাবার ফুলে উঠে।
- যে সকল খাবারে ভিনেগার এবং টমেটো যোগ করা হয়, তারা অম্লত্ব প্রশমনে সাহায্য করে। বাড়তি চিনি যোগ করার উপকারিতা নিঃসন্দেহে রয়েছে। এর সঙ্গে কিছু কঠিন চর্বিও যোগ করা হয়। কঠিন চর্বি এবং বাড়তি চিনিকে একসঙ্গে 'সোফাস' বলা হয়। আজকাল অনেক দেশের নাগরিকদের মোট ক্যালরি চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ আসছে সোফাস থেকে। যখন কারও দৈনিক ক্যালরি চাহিদার এত বেশি অংশ চর্বি এবং চিনি থেকে আসে, তার অর্থ তাদের খাবার কোনভাবেই সুষম নয়। এজন্য মানুষ মেদভুঁড়ি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার শিকার হচ্ছে।

বাড়তি চিনি যে সকল স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে তা হচ্ছে-

- **শরীরের ওজন বৃদ্ধিঃ** ওজন বাড়ার নানা কারণ রয়েছে। কিন্তু বাড়তি চিনি এক্ষত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফাস্টফুড এবং পানীয়ের বাড়তি চিনি মানেই অতিরিক্ত ক্যালরি। এ সকল খাদ্য গ্রহন করলে পরিমাণের তুলনায় অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহন করা হয়। ফলে সহজেই ওজন বাড়ে।
- **দাঁতের ক্ষয়ঃ** যে কোনো চিনি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। আর এর ফলে দাঁত ক্ষয় হয়। এজন্য শিশু-কিশোরদের অধিকাংশেই দাঁতের অবস্থা শোচনীয়। যত বেশি ফাস্টফুড এবং পানীয় গ্রহন করা হবে ততই দাঁত ক্ষয়ের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিশেষত চকোলেট, ক্যান্ডি, চুইংগাম, কেক-পেস্ট্রিজাতীয় খাবার ঘন ঘন গ্রহন করলে এ সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। কারণ আমরা দাঁতের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে মোটেও সতর্ক নই।
- **রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়ঃ** অতিরিক্ত বাড়তি চিনি শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। দৈনিক আমাদের জন্য কতটুকু বাড়তি চিনি নিরাপদ এর কোন সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। তবে বলা হচ্ছে, খাবারে বাড়তি চিনি যত কম থাকে ততই মঙ্গল। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে খাদ্য নির্দেশনা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বাড়তি চিনি গ্রহণের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সার্বিকভাবে কারও দিনে ৫ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি ক্যালরি সোফাস থেকে আসা উচিত নয়। কিন্তু এখন অনেকে এর দ্বিগুণ বা তিনগুণ ক্যালরি সোফাস থেকে গ্রহন করছেন। আমেরিকান হার্ট এ্যাসেসিয়েশন আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, কোন মহিলার দৈনিক খাদ্য তালিকায় ১০০ ক্যালরির বেশি বাড়তি চিনি থাকা উচিৎ নয়; আর একজন পুরুষের জন্য এটা ১৫০ ক্যালরির বেশি হওয়া উচিত নয়।

অর্থাৎ আমাদের সারাদিনের খাবারের তালিকায় ৬ চামচ (মহিলাদের জন্য) থেকে ৯ চা চামচ (পুরুষদের জন্য) বেশি বাড়তি চিনি থাকা উচিত নয়। অধিকাংশ পশ্চিমা নাগরিক দিনে ২২ চা চামচ অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কিভাবে খাবারে বাড়তি চিনি কমাবো ? এর উত্তর খুবই সহজ-

- চিনিযুক্ত খাদ্য যতটা পারা যায় পরিহার করতে হবে।
- ক্যান্ডি, চুইংগাম, চকোলেট, আইসক্রীম, কেক, পেস্ট্রিজাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে।
- কেক, কুকি এবং অন্যান্য মিষ্টি স্ন্যাকসের পরিবর্তে তাজা ফলমূল খাওয়া উত্তম।
- মিষ্টি ফলের পরিবর্তে কম মিষ্টি কিংবা টক ফলকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- মিষ্টি সিরাপে সংরক্ষিত কৌটাজাত খাদ্য পরিহার করতে হবে।
- ফলের রস এবং মিষ্টি কোমল পানীয়ের পরিবর্তে দুধ, ডাবের পানি কিংবা সাধারণ পানি পান করা শ্রেয়। মনে রাখতে হবে ১০০ ভাগ খাঁটি তাজা ফলের রসেও অতিরিক্ত চিনি থাকে।
- চা-কফিতে চিনি ব্যবহার না করা উত্তম কিংবা কম পরিমাণ চিনি ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় বাজারের কোন খাদ্যে চিনি আছে তা বুঝতে পারা যায় না। শুধু মনে রাখতে হবে সকল কোমল পানীয় এবং ফলের রসে বাড়তি চিনি থাকে। অন্যান্য খাবারে চিনির পরিমাণ জানার জন্য মোড়কের গায়ে লেখা উপাদানের তালিকা দেখতে হবে। অনেক সময় চিনির নাম নানা রকম হয়ে থাকে। সাধারণ খাবারে যে সকল চিনি ব্যবহার করা হয় তার নামের তালিকা দেয়া হলো-
- **বাদামি চিনিঃ** মোলাসেসযুক্ত দানাদার সাদা চিনি বেকিংয়ের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়।
- **আখের রস এবং আখের সিরাপঃ** এটাকে পরিশোধন করলেই সাদা চিনি পাওয়া যায়।
- **কনফেকশনারস সুগারঃ** সাধারণ সাদা চিনি আরও মিহি গুঁড়া করে এর সঙ্গে কর্ন স্টার্চ মেশানো থাকে। সাধারণত আইসক্রীমে ব্যবহার করা হয়, কেক বিস্কুটের ওপর আস্তর দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- **কর্ন সিরাপঃ** শস্যজাত চিনি।
- **ডেক্সট্রোজঃ** গ্লুকোজের আরেক নাম।
- **ফ্রুক্টোজঃ** ফল, মধু এবং সব্জি থেকে প্রাপ্ত চিনি: শরীরের ভেতরে গিয়ে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হতে পারে।
- **দানাদার সাদা চিনিঃ** এটাই আমাদের পরিচিত চিনি যা আমরা চা-কফিতে ব্যবহার করি।
- **মধুঃ** এতে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং সুক্রোজের মিশ্রণ যুক্ত চিনি থাকে।
- সুক্রোজের প্রক্রিয়াজাত করে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজের মিশ্রণ হিসেবে তৈরি খাদ্যদ্রব্যকে সতেজ সংরক্ষণের জন্য ব্যহার করা হয়।
- **ল্যাক্টোজঃ** দুধে যে চিনি পাওয়া যায়।
- **ম্যাল্টোজঃ** রুটি এবং শিশুখাদ্যে ব্যবহৃত চিনি।
- **মল্ট সিরাজঃ** শস্য বাটা এবং সদ্য অঙ্কুরিত বার্লি থেকে প্রস্তুত করা মিষ্টি রস।
- **মোলাসেসঃ** আরেক নাম চিটাগুড়।
- **সুক্রোজঃ** সাদা দানাদার চিনির আসল নাম।

অবশেষে মনে রাখতে হবে চিনি যে নামেই ব্যবহার করা হোক না কেন, অতিরিক্ত গ্রহণ করা ক্ষতিকর।

আনারসের উপকারিতা

প্রকৃতিতে এসেছে পরিবর্তন বসন্তকালে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের গরম। সূর্যের কঠোরতায় অনেকেরই জ্বর হচ্ছে। আর যাদের কখনোই বসন্ত হয়নি, তারা মৌসুমী রোগ বসন্ত দূর করার জন্য খান প্রচুর পরিমাণে মৌসুমী ফল। গরম-ঠান্ডার জ্বর, জ্বর-জ্বর ভাব দূর করে এই ফল। এতে রয়েছে ব্যথা দূরকারী উপাদান। তাই শরীরের ব্যথা দূর করার জন্য এর অবদান গুরুত্বপূর্ন। আনারস কৃমিনাশক। কৃমি দূর করার জন্য খালি পেটে (সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে) আনারস খাওয়া উচিত। দেহে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় এই ফল। ফলে শিরা-ধমনির (রক্তবাহী নালি) দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃৎপিন্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃৎপিন্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি, যা দেহের কাটা, ছেঁড়া, ইনফেকশনজনিত সমস্যা দূর করে।

জিহ্বা, তালু, দাঁত, মাড়ির যে কোনো অসুখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আনারস। দাঁতের অপারেশনের পরে আনারসের রস শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। এতে রয়েছে খনিজ লবন ম্যাঙ্গানিজ, যা দাঁত, হাড়, চুলকে করে শক্তিশালী।

আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃৎপিন্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি

গবেষনা করে দেখা গেছে যে নিয়মিত আনারস খান এমন ব্যক্তিদের ঠান্ডা লাগা, গলাব্যথা, সাইনোসাইটিস-জাতীয় অসুখগুলো কম হয়। এই ফলে রয়েছে প্রচুর ক্যালরি, যা আমাদের শক্তি জোগায়। এ ফলটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে, ত্বককে কুচঁকে যাওয়া থেকে বাঁচায়। আনারস টাটকা খাওয়াই ভালো।

গোড়ালি মচকানো এবং করণীয়

গোড়ালি শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ন জোড়া, যা প্রতিনিয়ত দাঁড়াতে, হাঁটতে, দৌড়াতে এবং ওঠানামা করতে ব্যবহৃত হয়। এসব কাজের নিমিত্তেই গোড়ালি সচরাচর মচকানো জাতীয় ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও গর্তে পড়ে গেলে, রিকশা বা বাস থেকে নামতে গিয়ে, সিঁড়িতে এক ষ্টেপ ভুল করলে, খেলাধুলার সময়, ডিফেক্টিভ জুতা পরলে, এমনকি বিছানা থেকে উঠতে গিয়েও গোড়ালি মচকাতে পারে। ইনজুরির তীব্রতার তারতম্যে গোড়ালির লিগামেন্ট আংশিক বা সম্পূর্ন ছিঁড়ে যেতে পারে। কিছু মচকানো আঘাত অল্প দিন পর ভালো হয়ে যায়। একে তৎক্ষনাৎ (অ্যাকুট) মচকানো বলে। যখন মচকানো ইনজুরি দুই সপ্তাহের বেশি সময় রোগীকে আক্রান্ত করে রাখে, তখন একে ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী মচকানো বলে। মচকানোর ফলে জোড়ায় ব্যথা হয় এবং জোড়া ফুলে যায়। ফোলা ও ব্যথার জন্য জোড়া নড়াচড়া করানো যায় না। পায়ে ভর দিলে ব্যথা বেড়ে যায়।

ইনজুরির তীব্রতার তারতম্যে গোড়ালির লিগামেন্ট আংশিক বা সম্পূর্ন ছিঁড়ে যেতে পারে। কিছু মচকানো আঘাত অল্প দিন পর ভালো হয়ে যায়

করণীয়

- গোড়ালিকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।
- দু-তিন দিন পায়ে ভর না দিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে।
- বরফের টুকরা টাওয়ালে বা ফ্রিজের ঠান্ডা পানি প্লাষ্টিকের ব্যাগে নিয়ে লাগালে ব্যথা ও ফোলা কমে আসবে। প্রতি ঘন্টায় ১০ মিনিট বা দুই ঘন্টা পর পর ২০ মিনিট অনবরত লাগাতে হবে। তবে এটা সহ্যের মধ্যে রাখতে হবে। এ পদ্ধতি আঘাতের ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত চলবে।
- স্প্লিন্ট ব্যবহার করে পা উঁচু রাখলে ফোলা কম হবে।
- ইলাসটো কমপ্রেসন (ইলাসটিক সার্পেটি বা অ্যাংলেট) ব্যবহার করলে ফোলা ও ব্যথা কম হবে।
- অ্যানালজেসিক বা ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করতে হবে।
- আঘাতের ৪৮ ঘন্টা পর কুসুম গরম পানির সেক বা ঠান্ডা সেক ব্যবহারে ব্যথা কম হবে।
- গোড়ালির স্বাভাবিক নড়াচড়া এবং পেশি শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম করতে হবে।
- অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী ইনজুরির ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল থেরাপি এসডব্লিউডি ও ইউএসটি প্রয়োজন হতে পারে।

কখন চিকিৎসা প্রয়োজন?

- অসহ্য ব্যথা বা ব্যথা কোনভাবেই নিয়ন্ত্রন করা না গেলে।
- আঘাতপ্রাপ্ত গোড়ালি কিছুতেই নাড়াতে না পারলে।
- ফোলা ছাড়াও গোড়ালি বা পা অস্বাভাবিক আকৃতি হলে।
- খুঁড়িয়ে চার কদমের বেশি হাঁটা না গেলে।
- পায়ের আঙুল নিচু করতে অসুবিধা হলে ।
- পায়ের পেশিতে ব্যথা হলে বা ফুলে গেলে।
- চামড়া লাল হয়ে দ্রুত বিস্তৃত হলে।
- গোড়ালির এক্স-রে করে (প্রয়োজনে সিটি স্ক্যান ও এমআরআই) অন্যান্য ইনজুরি যেমন ফ্র্যাকচার ও জোড়ার ডিসপ্লেসমেন্ট নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে।

গ্রীষ্মে দই এর উপকারিতা

দুগ্ধজাত সব খাবারের মধ্যে দই হলো সবচেয়ে সহজপাচ্য। দুধের সব পুষ্টিগুন দইয়ের ভেতর থাকে। অনেকে মনে করেন, দই চর্বিবিহীন খাদ্য। আসলে তা নয়, এতে দুধের সমানই চর্বি থাকে। ১০০ গ্রাম টক দই থেকে আমিষ পাওয়া যায় তিন গ্রাম, চর্বি চার গ্রাম ও ৬০ ক্যালরি থাকে।

দুগ্ধজাত সব খাবারের মধ্যে দই হলো সবচেয়ে সহজপাচ্য। দুধের সব পুষ্টিগুন দইয়ের ভেতর থাকে

মিষ্টি দইয়ে চিনি মেশানো হয় বলে আরও ৪০ ক্যালরি বেশি পাওয়া যায়। দুধ পাকস্থলীতে গিয়ে বিশ্লিষ্ট হয় দইয়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুধ পান করার পর দই হয়ে যায় বলে দইকে প্রি ডাইজেস্টেড দুধ বলা যেতে পারে। যাদের দুধ হজম হয় না, তাঁরা দই খেলে দুধের সমান উপকার পাবেন। বিশেষ করে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের দুধ একান্ত প্রয়োজন। এদিকে দইয়ের মধ্যে স্ট্রেপটো কক্কাস থার্মোফিলাস নামে একধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। এই ব্যাকটেরিয়াতে যাদের এলার্জি রয়েছে, তারা দই খেলে গলার স্বর ভাঙতে পারে। সর্দি থাকলে তাও বেড়ে যেতে পারে। দই মিট টেন্ডারাইজারার' হিসেবে কাজ করে। আবার মাছ-মাংস বেশি বা অধিক গুরুপাক খাবার খেলে, তা থেকে শরীরে 'পিউট্রিফ্যাকটিক' নামের যে ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হয়, যা শরীরে ক্ষতি করতে পারে, সেটা প্রতিরোধ করার জন্য দই ভীষণ উপকারী।

মহৌষধ পেঁয়াজ

পেয়াজের বাদামি আবরন ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। রান্নার সময় আমরা পেঁয়াজের গায়ে লেগে থাকা যে পাতলা বাদামি আবরন ফেলে দিই তাতে মানবদেহের জন্য উপকারী বিশেষ যৌগ পদার্থ রয়েছে। গবেষকরা বলছেন, বাদামি আবরন এবং পেঁয়াজের মোটা খোসাগুলো (আঁশ) এবং ফ্লাভোনয়েড সমৃদ্ধ। পেঁয়াজের ভেতরের নরম শাসগুলো ফ্রাকটুনাস এবং সালফার যৌগ উপাদানে সমৃদ্ধ; মানবদেহে রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা বাড়ায়। আঁশ জাতীয় খাবার ক্যান্সার প্রতিষেধক। পেঁয়াজের মধ্যে এ গুনটি রয়েছে।

পেয়াজের বাদামি আবরন ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়

পেঁয়াজের বাদামি আবরনে কুয়েরসেটিক এবং অন্যান্য ফ্লাভোনয়েড রয়েছে। পথ্যগুন সমৃদ্ধ আবরনের পরের মোটা দুটি খোসাতেও রয়েছে আঁশ এবং ফ্লাভোনয়েড। অন্যান্য আঁশ জাতীয় খাদ্যের মতো খেলে হৃদরোগ, পেটের পীড়া, কোলন ক্যান্সার, স্থূলকায় রোগ এবং ডায়াবেটিসের (ধরন-২) ঝুঁকি হ্রাস পায়। ফেনোলিক যৌগের কারনে হৃৎপিন্ডে রক্ত বহনকারী ধমনীর (করোনারী) জটিলতা বা রোগমুক্তির জন্য পেঁয়াজ অতুলনীয়।

গরমে সুস্থ্য থাকার উপায়

এই গরমে খেতে হবে অল্প পরিমাণে। নীরোগ যারা সকালের খাবারে একটু মিষ্টি রাখুন, কিংবা ফলের রস। কর্মক্ষমতা বেড়ে যাবে অনেক। দুপুরের খাবারে সালাদ রাখুন নিত্যদিন। সালাদের খনিজ উপাদান রক্তের ঘনত্ব কমিয়ে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করবে।

ত্বকের পোড়া ভাব দূর করতে সবুজ চা খুব উপকারী। পেয়াজের রস সূর্যরশ্মিতে ত্বকের যে ক্ষতি হয় তা সারিয়ে তুলতে এটি খুবই কার্যকর। এ সময়টার ঝাল খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। ঝাল শরীরকে সাময়িক উষ্ণ করে শীতল করতে সাহায্য করবে।

গরম আবহাওয়ার শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে দৈনিক আট থেকে দশ গ্লাস পানি পান করুন। দৈনিক খাবারের তালিকায় গরু ও খাসির মাংসের পরিমান কমিয়ে দিন। মাছ খান প্রচুর। ঠান্ডা খাবার আর কোমল পানীয় হজমে যেমন বিরূপ প্রভাব ফেলে, তেমনি শরীরের নিজস্ব তাপ নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়াকেও বাধাগ্রস্থ করে।

মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখবে পানি

বিজ্ঞানীদের মতে, মাত্র তিন পাউন্ড ওজনের ব্রেন আমাদের শরীরের মোট পান করা পানীয়ের ২৫ ভাগ ব্যবহার করে। আর পরিমাণ মতো পানি পান করলে মস্তিষ্কের শক্তি যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি চিন্তাশক্তিও বাড়ে আনুপাতিক হারে। মস্তিষ্কের আরেকটি প্রধান খাবার হচ্ছে গ্লুকোজ। মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় শত্রু প্রবল মানসিক চাপ।আমরা যে শর্করা খাই তা আবার মানসিক চাপের কারনে মস্তিষ্কে যথাযথভাবে সরবরাহ না হয়ে শরীরের অন্যত্র শোষিত হয়। তাই মানসিক চাপ মস্তিষ্ককে অভূক্ত রাখে। ব্রেন বা মস্তিষ্কের সুস্থতা বজায় রাখতে যা করনীয় তা হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের অন্তত আট গ্লাস পানি পান করতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে হবে ও মাঝেমধ্যে মস্তিষ্ককে অবসর দিতে হবে।

ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপলাই কার্ডের ইনফো কুইজ অংশে সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দিন এবং এটি ১৫ আগষ্ট ২০১২ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

১) সরল জ্বরের লক্ষন গুলো কি কি?

ক) শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি

খ) মাথা ধরা ও মাথা ঘোরা

গ) চোখ ও শরীর জ্বালা করা

ঘ) উপরোক্ত সবগুলো

২) ডেঙ্গু জ্বরে শরীরের তাপমাত্র কত অবধি উঠে?

ক) ৯৯°-১০১° ফারেনহাইট

খ) ১০১°-১০২° ফারেনহাইট

গ) ১০২°-১০৫° ফারেনহাইট

ঘ) ১০০°-১০৩° ফারেনহাইট

৩) ম্যালেরিয়ার ধরন কোনটি নয়?

ক) বিনাইন টারসিয়ান

খ) অ্যাকুট টারসিয়ান

গ) কোয়ার্টান

ঘ) ম্যালিগনেন্ট টারসিয়ান

৪) টনসিল প্রদাহের কারন কি?

ক) এক জাতীয় ভাইরাস

খ) পানি বাহিত রোগ

গ) সংক্রমন

ঘ) মুখগহ্বরের জীবানুর ভান্ডার

৫) বাহ্যিক লক্ষন অনুযায়ী হামকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) চার

খ) তিন

গ) দুই

ঘ) এক

৬) নিম্নের কোনটি ইনজেকশন সিরিঞ্জ এর অংশ নয়?

ক) এয়ার ফিল্টার

খ) ব্যারেল

গ) পিষ্টন

ঘ) নিডল

৭) ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন কোথায় দেয়া হয়?

ক) শরীরের যে সকল অংশের চামড়া লুস থাকে

খ) গ্লুটিয়াল পেশী বা বাহুর উপরের অংশের ডেল্টয়েড পেশী

গ) কনুইয়ের ঠিক সামনের শীরাতে

ঘ) শিরদাঁড়া বা মেরুদন্ডের মধ্যে

৮) অভ্যন্তরীন পাইলসকে ডিগ্রী অনুযায়ী কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) চার

খ) ছয়

গ) দুই

ঘ) তিন

৯) পাইলস রোগের উপসর্গ নয় কোনটি?

ক) মলদ্বার থেকে রক্ত যাওয়া

খ) মলদ্বারের বাইরে মাংস পিন্ড ঝুলে পড়া

গ) তল পেটে ব্যথা হওয়া

ঘ) মলদ্বার থেকে মিউকাস নিঃসৃত হওয়া

১০) সারা দিনের খাবার তালিকায় কয় চামচ চিনি থাকা উচিত?

ক) ৪-৫ চা চামচ

খ) ৬-৯ চা চামচ

গ) ৮-১২ চা চামচ

ঘ) ২-৩ চা চামচ

এসিআই লিমিটেড